ইসলাম : শোষক শ্রেনীসমূহের মতাদর্শ ও হাতিয়ার

নাসরীন জাযায়েরি

(লেখক ইরানের কমিউনস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী-মাওবাদী)-র একজন সমর্থক। আলোচ্য নিবন্ধটি "**যুদ্ধ ইসলাম প্রতিরোধ**; সম্পাদনা : চিররঞ্জন পাল এবং রাজেশ দত্ত; প্রকাশ- জানুয়ারী, ২০০৪; র‍্যাডিক্যাল প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০৭৩" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।)

আজকের দুনিয়ায় একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলামের ভূমিকাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য নিচের নিবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। ইসলাম এ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে ধর্মের সাম্প্রতিক উত্থানের মুখে বিপ্লবীদের কাজের অংশ মাত্র। মাত্র কয়েক দশক আগেও ধর্মের এমন ধরনের পুনর্জাগরণ অকল্পনীয় বলে মনে হতো। অংশত সমাজতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদের উত্থানের কারণে বিশ্বের বিশাল এলাকা জুড়ে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপারে পর্যবসিত হয়ে পড়েছিল বলে মনে হতো। কিন্তু বিশ্ব বদলে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ও পরে চীনের বিপ্লব পরাজিত হয়েছে। ১৯৬০-এর দশকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দুনিয়া কাঁপানো তরঙ্গমালায় ভাটা পড়েছে। আরও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, দরিদ্র জনগণ যখন প্রযুক্তিতাড়িত 'বিশ্বায়ন'-এর সাথে পায়ে পায়ে চলা ঘনীভূত উৎপাদন ও নিঃস্বায়নের জগদ্দল পাথরের নীচে পিষ্ট তখন, গণহন্তারক ভয়াল অস্ত্রশস্ত্র ও ধনীদের বিলাস সামগ্রীর সাথে একত্রে চিহ্নিত বিজ্ঞান লক্ষ কোটি জনগণের চোখে আরো নিন্দনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে।

কাজেই ধার্মিকতার এই নতুন তরঙ্গ বিশ্ব বিপ্লবের পরাজয় এবং জনগণের উপর চাপানো বিভীষিকার সন্ত্রাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

ধর্ম অব্যাহতভাবে শাসকদের হাতে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ছোট বুশ মার্কিন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে খ্রিষ্টান ফ্যাসিবাদীদের যে নিয়োগ করেছে তা নিজেদের বৈধতাকে ঠেকনা দেওয়া, দুঃখ-দুর্দশার প্রকৃত কারণ বোঝার ক্ষেত্রে জনগণের সক্ষমতাকে ভোতা করে দেওয়া এবং বুর্জোয়া শাসনের 'মূল মূল্যবোধ'-এর পেছনে কট্টর প্রতিক্রিয়াশীলদের সমাবেশিত করার কাজে ধর্মকে ব্যবহার করার প্রতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কতটা গুরুত্ব দেয় তারই ইঙ্গিত বহন করে। হিটলার যেমন জার্মানীকে যুদ্ধে সামিল করার কাজে সেমেটিক জনগোষ্ঠী বিরোধী বিদ্বেষকে ব্যবহার করেছে, ঠিক তেমনিভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও স্বদেশ বা বিদেশে তাদের নতুন সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কাজে স্বীয় নাগরিকদেরকে জড়িয়ে ফেলতে খ্রিষ্টীয় মৌলবাদীদের মতাদর্শের ঘাড়ে সওয়ার হচ্ছে। এভাবে বুশ ইসলামি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ডাক দিয়েছে, চীনাদেরকে 'ঈমান' আনতে উপদেশ দিচ্ছে আর এমন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের নির্দেশ তুলে ধরার জন্য সম্মানিত মার্কিন সিনেটরগণ বাইবেল পাঠের মাধ্যমে ১১ সেপ্টেম্বরের হতাহতদের স্মরণ করে। বাস্তবিক পক্ষে, প্রতিক্রিশীল অপরাধের পতাকাবাহী হিসেবে ধর্ম যে ভূমিকা পালন করছে সেই বিচারে খ্রিষ্টীয় মতবাদের আজো তুলনা নেই।

এই নিবন্ধে ইসলামের উপর আলোচনা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে এমন কোন বিশ্বাস থেকে নয় যে, অন্যান্য ধর্ম থেকে এটি কোনো না কোনো রূপে মৌলিকভাবে ভিন্ন। বিপরীতক্রমে, মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মার্কসবাদ বরং সকল ধর্মকেই সমভাবে বিচার করে। তবে বিশ্বের নিপীড়িত এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের উপর

ইসলামের অবশ্যই প্রভাব রয়েছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের জাত্যাভিমান থেকে ইসলামি মৌলবাদকে যে টার্গেট করেছে, এর বিপরীতে মাওবাদীরা ইসলাম ধর্মীয় শক্তিসমূহের নেপথ্য প্রকৃত স্বার্থকে উন্মোচন করতে চাচ্ছে, যাতে এই দুনিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অংশের জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী অধিকতর দৃঢ় ও সামগ্রিক লড়াইয়ে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে শাসকগোষ্ঠী বিরোধী ইসলামিক রাজনৈতিক পার্টি বা গ্রুপগুলো কমপক্ষে গত তিন দশকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বড় মাপের ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ও মধ্যপ্রাচ্যস্থ তাদের নয় উপ্নিবেশিক গ্রাহক রাষ্ট্রের বিরোধীতাকারী ও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই (বা জেহাদ) পরিচালনাকারী বলে দাবিদার এই সকল ইসলামি শক্তি কখনো কখনো এবগ্ন গুরুত্বপূর্ণ মাত্রায়, নয়া গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি শ্রমিক, কৃষক ও আধা-সর্বহারাদের কোনো কোনো অংশকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তাদের মতাদর্শ কিংবা কর্মসূচি কোনোটাই সামান্যতম মাত্রায়ও জনসাধারণের স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রসমূহ উৎখাত করা ও সাম্রাজ্যবাদকে হঠানোর লক্ষ্যে জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা ও সংগঠিত করার কাজে মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবী কমিউনস্ট শক্তিগুলোর সামনে একটা অব্যাহত ও জোরালো চ্যালেঞ্জ হলো এ সত্যকে উদঘাটন করা। ইরান ও আফগানিস্তান উভয়ের গত দুই দশকের বেশি সময়কালের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে ইসলাম মুক্তিদাতা কোন মতাদর্শ নয়। মধ্যপ্রাচ্যের কদর্য নিপীড়ক কুৎসিত সমাজগুলো হলো আধা-সামন্তবাদী, আধা-উপনিবেশিক যা গড়ে উঠেছে স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল বড় পুঁজিবাদী-সামন্ত শ্রেণীগুলোর সাথে সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজশে। এই নিপীড়ক কুৎসিত সমাজগুলো থেকে ইসলামি শক্তিগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির বিশেষ কোনো ফারাক নেই। যা হোক, মাও যেমনটা বলেছেন - "ঝাড়ু যেখানে পৌঁছোয় না, ধুলো সেখান থেকে আপনআপনি গায়েব হয় না।" ইতিমধ্যেই সুদীর্ঘকাল ধরে ইসলামি শক্তিসমূহ মধ্যপ্রাচ্যে নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করেছে, তাদের আত্মত্যাগকে বরবাদ করেছে এবং ধর্মীয় মতাদর্শগত শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের অসীম শক্তিকে অপচয় করার চেষ্টা করেছে। এভাবে, ইসলামি শক্তিগুলো দুনিয়ার এ অংশে বিপ্লবকে বিলম্বিত করার পেছনে ভূমিকা রেখেছে এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকে বড় মাপের সেবা প্রদান করেছে।

তা ছাড়া, আজকের দুনিয়ায় মানবতার সবচাইতে ভয়ংকর ও শক্তিশালী দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে ইসলামি মৌলবাদীদেরকে তার শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছে (সশস্ত্র ধর্মীয় চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আছিলায় বাস্তবে এটা হচ্ছে এই অঞ্চলে জনসাধারণের উপর আক্রমণ) স্রেফ এই ঘটনাটি তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের প্রতি এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ গড়ে তুলেছে। জনসাধারণকে সেসব কিছুকে সর্বদাই স্বতঃস্ফুর্তভাবে উর্ধ্বে তুলে ধরতে দেখা যায় যা তাদের নিপীড়কদের বেপরোয়া আক্রমণের শিকার। কিন্তু জনসাধারণের প্রয়োজন একটা বিপ্লবী বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ যা সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারে আর সকল প্রকার নিপীড়ন ও শোষনের জাঁতাকল থেকে মানবজাতির মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারে। এটা সারা দুনিয়ার বিপ্লবী কমিউনস্টদের দুটো কাজকে জোরালোভাবে সামনে নিয়ে আসে : তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়াতে হবে, প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র ক্ষমতা উৎখাত করায় জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিতে হবে ও বিপ্লব করত হবে ; এবং কই সাথে, একাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ও তাতে সফলতা অর্জনের জন্য, আগের যে কোনো সময়ের চাইতে অনেক জোরালোভাবে জনসাধারণের মাঝে ব্যাখ্যা করতে হবে যে ইসলামের মতাদর্শ (এবং প্রতিটি সামন্ত এবং বুর্জোয়া মতাদর্শ) হলো মুক্তির পথে বাধা আর সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে অক্ষম। সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে হলে জনসাধারণের প্রয়োজন কমিউনিজমকে গ্রহণ করা যা সারা

দুনিয়ায় এবং মানব জাতির ইতিহাসে একমাত্র সাচ্চা মুক্তিদাতা মতাদর্শ ও কর্মসূচি। এটা হচ্ছে একমাত্র মতাদর্শ যা সাম্রাজ্যবাদ, প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর উপর আধিপত্যকারী প্রিতক্রিয়াশীল রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে সবচাইতে দুনিয়া কাঁপানো সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। এই মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করাটা হলো উত্থানরত জনসাধারণকে প্রকৃত বিপ্লবের দিকে পরিচালিত করতে পারার সক্ষমতার অপরিহার্য অংশ, আর জনসাধারণ যখন প্রকৃত বিপ্লবের আদর্শ বাস্তবেই দেখতে পাবেন তখন সামগ্রিকভাবেই ধর্মের প্রভাব থিতিয়ে আসবে।

পথ--পরিক্রমা

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইসলাম হলো একটা জটিল ব্যাপার। পশ্চিমা উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ, মুসলিম দেশগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গ, এসব শাসক বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-শ্রেণী শক্তিসমূহের এসব বিভিন্ন গোষ্ঠী একে ব্যবহার করেছে; এবং কখনো কখনো বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরোধিতাকে সমাবেশিত করার উপায় হিসেবে জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ একে ব্যবহার করছে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সেখানকার শাসকবর্গের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক ইসলাম ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে তাই হবে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই রাজনৈতিক ইসলামই সেই প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর শক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যকে ব্যাপকভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছে যে শ্রেণীকে ক্ষমতার কাঠামো থেকে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং বিরাজমান রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরেই অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থা ফিরে পাবার জন্য ধাপ্পাবাজি চালাচ্ছে। যেখানে এবং যতটা মাত্রায় জনসাধারণ এসকল শক্তির প্রতি আকর্ষিত হয়েছে, তা মূলত কোনো ধরনের তথাকথিত ধর্মীয় উদ্দীপনার কারণে নয়, বরং অধিকতরভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের পুতুল শাসকবর্গ কর্তৃক জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া চরম অন্যায় অবস্থার প্রতিকৃয়া হিসেবে।

রাজনৈতিক ইসলাম আদৌ নতুন কোনো ব্যাপার নয়। ইসলাম নিজেই জন্মেছে ধর্মকে প্তাকা হিসেবে ব্যবহারকারী একটা 'পার্থিব' রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে। গোড়াতে তা ছিল আরব উপদ্বীপের মক্কা নগরীর মুহাম্মদ কর্তৃক নির্দেশিত। এটা কোনো এক আল্লাহ্‌র কথা নয়, ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে এর আবির্ভাবে ঘটেছিল সামগ্রিকভাবে বিশ্বের ঐ অংশে জুড়ে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ফল হিসেবে (১)।

ইউরোপের অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবের পর, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে আসে। কিন্তু সামন্ত ইসলামি দেশগুলোতে ধর্ম রাষ্ট্রের একটা স্তম্ভ হিসাবে বিরাজ করতে থাকে। প্রাক-উপনিবেশিক ইসলামি সমাজে উলেমা (উচ্চপদস্থ ইসলামি মোল্লাতন্ত্র) ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতার দুটি স্তম্ভের একটি; অপর স্তম্ভ ছিল সার্বভৌমত্ব বা বাদশা। এটা ছিল ইউরোপীয় সামন্তবাদের প্রায় অনুরূপ, এমন এক সমঝোতা যার আওতায় রাজা ও যাজকতন্ত্র সামন্ত ক্ষমতা ও লুটের মাল ভাগাভাগি করে নিত।

উনিশ শতকে আরব ও মুসলিম দেশগুলোর উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী দখলদারিত্ব ছিল এই সমাজগুলির একটা বিভাজন রেখা (২)। শতাব্দীর শেষ দিকে এসে ঐ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর সকল সামন্ত উপাদানকে ঢেলে সাজানো হয় বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অধীনে এবং তারই স্বার্থে। মধ্যপ্রাচ্যে উপনিবেশবাদীরা খোদ স্থানীয় ধর্মের উপরেই নির্ভর করেছে যা লাতিন আমেরিকার থেকে ছিল ভিন্ন। আরব থেকে সুন্নী তুর্কি শাসকদের উৎখাতের যুদ্ধের সময় বৃটিশরা সৌদি

আরবে ইসলামের ওহাবি শাখাকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকায় নিয়ে এসেছিল এবং তাকে ব্যবহার করেছিল ঐ অঞ্চল থেকে তুর্কি সাম্রাজ্যকে তাড়িয়ে দেওয়ার উপনিবেশ-জয়ের যুদ্ধের ক্ষেত্রে আদর্শিক ও নৈতিক ভিত্তি হিসেবে। বৃটিশ উপনিবেশবাদের সহায়তায় ১৯৩২ সালে আল-সাউদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কেবলমাত্র পরেই ইসলামের ওহাবি শাখা এবং মক্কা ইসলামি হজ্ব-জমায়েতের কেন্দ্র হিসেবে চলতি গুরুত্ব অর্জন করে। উনিশ শতকে উপনিবেশবাদী জারতন্ত্রী রাশিয়ার বিরুদ্ধে বৃটিশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়কালে ইরানের শিয়াপন্থী উলেমারা বৃটিশের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে ছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে (১৮৮৬) বৃটিশেরা জারতন্ত্রী রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইরানের শাহকে জেহাদের ডাক দিতে প্ররোচিত করে। রুশ জারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধর্মীয় ছুতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইরাকের নাজাফ শহরে শিয়া মোল্লাদের হুকুমে লেখা হয়েছে গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে জিহাদ সম্পর্কিত সর্বপ্রথম ধর্মীয় পুস্তক। "প্রতিটি মোল্লার পাগড়ির নিচে লেখা রয়েছে : 'ইংল্যান্ডে তৈরি' "-এই পুরোন জনপ্রিয় ইরানি লোকবাণীতে এই বৃটিশ-মোল্লা গাঁটছড়া প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে, মিশরে এক বড় ধরনের আধুনিক ইসলামি ভাবধারা - হাসান আল-বান্না (১৯০৬-১৯৪৯) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ব্রাদারহুড এর উত্থান ঘটে। এটা পরবর্তীতে অপরাপর সুন্নী-প্রধান দেশসমূহে বিকাশমান অন্যান্য রাজনৈতিক ইসলামিক শক্তির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। মূল মুসলিম ব্রাদারহুড বুদ্ধিজীবিদের একাংশের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করে, কারণ-এটা উপনিবেশবাদীদের নৈতিকতার বিপরীতে একটা আধুনিক, দেশীয় মতাদর্শের প্রস্তাবনার কাজকে হাতে তুলে নেউ। মিশরে বৃটিশ আধিপত্য এবং কায়রোর দরিদ্র জনসাধারণকে ঘিরে ধরা চরম নিঃস্বতার বিরোধিতার কারণে এটা জনসাধারণের একাংশের মধ্যেও আবেদন সৃষ্টি করে। কিন্তু বান্না ও মুসলিম ব্রাদারহুড কখনই নির্দিষ্টভাবে কৃষি বিপ্লবের জন্য কৃষক সাধারণকে জাগিয়ে তোলা ও পিতৃতান্ত্রিকতার কবল থেকে নারীদেরকে মুক্ত করার মাধ্যমে পশ্চাদপদতা কাটিয়ে ওঠার অর্থাৎ সামন্তবাদকে উৎখাতের মৌলিক প্রয়োজনীয়তার ডাক দেয়নি। বাস্তবে তাদের হাতে ধরা ছিল দুটো বার্তা : দরিদ্র জনসাধারণের আধ্যাত্মিক পরিত্রাণের জন্য কুরআন ও সুন্না (ইসলামি ঐতিহ্য)'র বিধি বিধানে ফিরে যাওয়া ; আর বিদেশী আধিপত্য এবং মিশরের পশ্চাদপদতা এই উভটার জন্য বিচলিত বুদ্ধিজীবীদের জন্য তাদের হাতে বার্তা ছিল ভিন্ন : একটা আধুনিক ইসলাম যা তাদেরকে দেবে আধা-সামন্তবাদী আধা-উপনিবেশিক দেশ পরিচালনার জন্য পশ্চিমা ব্যবস্থাপনার হাতিয়ের ব্যবহারের পাশাপাশি একটা 'দেশীয়' বা 'জাতীয়' পরিচিতি। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, অন্য সকল ধর্মের মতোই ইসলামও শোষণ-পীড়নের আধুনিক রূপের খবরদারির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে সম। একই সাথে উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পশ্চাদপদতা কাটিয়ে ওঠার প্রশ্নে বিপ্লবী ঝান্ডার বিপরীতে ধর্মীয় পতাকার সীমাবদ্ধতাকেও তা দেখিয়ে দেয়।

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক ব্যাপী যারা বিদ্যমান অবস্থার বিরোধিতা করতো তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ইসলামের প্রভাব ছিল খুবই সামান্য। প্রকৃতপক্ষে, সংগঠিত ইসলামকে বিদেশের তাবেদার গোষ্ঠী হিসেবে বিদ্রুপ করা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি ছিল এসব সমাজের আরেক বিভাজন রেখা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ এসব দেশে নতুন আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলে। নতুন এ কাঠামোতে মোল্লারা ক্ষমতার অতি সামান্য ভাগই লাভ করে। মধ্যপ্রাচ্যীয় বিভিন্ন দেশে ইসলামিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হতে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রবল বিরোধিতাকারী এক রাজনৈতিক ধারা বিকাশ লাভ করে। তারা শাসক চক্র ও সরকারী ইসলামকে দুর্নীতিবাজ ও অপাংক্তেয় বলে নিন্দা জানায়। প্রকৃতপক্ষে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ইসলামিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন প্রধানত এ সময়কালে, যদিও

সেসবের মতাদর্শগত পূর্বসূরীরা তাদের রাজনৈতিক চিন্তাকে গ্রথিত করতে শুরু করে আরও আগে (৩)। (এই নিবন্ধ তার পর্যালোচনাকে কেন্দ্রীভূত রেখেছে সেই সব ইসলামি শক্তি সম্পর্কে যারা ইসলামের ধর্মীয় পতাকাদোলানো পশ্চিমাপন্থী মধ্যপ্রাচ্যীয় শাসকগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছে)।

এসব ইসলামি আন্দোলনের নেতারা ও মূল কর্মীবাহিনী সাধারণভাবে মোল্লাগোষ্ঠী থেকে আগত যারা শাসন কাঠামোতে তাদের পুরোনো শান-শওকতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চায় বা ক্ষমতা ব্যবস্থায় আরো সুবিধা দাবি করে ; একই সাথে উদ্ভুত অসন্তুষ্ট শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং শাসন-কাঠামো থেকে বাইরে ঠেলে দেওয়া সামন্ত-মুৎসুদ্দি শ্রেণী থেকে (অর্থাৎ এসব সমাজের শোষক ও সম্পত্তিবান শ্রেণীর অংশ)। কিন্তু এদের স্থলবাহিনীর সদস্যরা এসেছে শহরের মরিয়া ও উদ্বাস্তু জনসাধারণের মধ্য থেকে যারা ঐ সকল প্রতিক্রিয়াশীলদের 'বিরোধী পক্ষ সুলভ' ভাবভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত। প্রধানভাবে নেতা বা মূল কর্মীবাহিনীর শ্রেণী ভিত্তি এসকল ইসলামী আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার কারণ তা নয় ; বরং তা এ জন্য যে তারা একটি পরিত্যক্ত মতাদর্শ, একটি ধর্মীয় মতাদর্শকে সামনে ঠেলছে যা বাস্তবতার ভিত্তির উপর গড়ে উঠেনি এবং সে কারণে আজকের দিনের বিশ্ববাস্তবতাকে রূপান্তর করতে একেবারেই অক্ষম এবং তারা প্রতিক্রিয়াশীল কারণ তারা নিপীড়নমূলক সমাজগুলোর একই শ্রেণী-কাঠামোকে রক্ষা করতে চায়, স্রেফ এগুলোকে 'আরও বেশি ইসলামসম্মত' করার মাধ্যমে (শরীয়া আইন প্রয়োগ করার মাধ্যমে, শরীয়া হলো ইসলামি আইন যার ভিত্তি কোরআন ও প্রথাকরণ- মুহাম্মদের মৃত্যুর পরে যা লিখিত এবং ইসলামি মতধারা দ্বারা বারবার পুনর্লিখিত হয়েছে)। এর একমাত্র অর্থ হলো এবং হয়ে এসেছে, সমাজের সামন্ত পিতৃতান্ত্রিক উপাদানগুলোর শক্তিশালীকরণ। মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অংশে এসকল আন্দোলন ইসলামের বিবিধ রূপের মধ্য থেকে একটাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, যেমন শিয়া বা সুন্নী। তবে কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও এদের প্রায় সকলেই ইসলামি মতাদর্শের মৌলিক স্তম্ভ মেনে চলে এবং আদি ইসলামি নবীদের প্রতিষ্ঠিত পুরোনো নমুনা অনুসারে প্রতিশ্রুত ইসলামি সমাজের রূপরেখা খাড়া করে। বিশেষত, এই সকল ধারা উপধারার প্রায় সকলেই মুহাম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজকে তাদের সবচেয়ে কাঙ্খিত আদর্শ বলে উল্লেখ করে। মুসলিম দেশগুলোর সকল দুর্ভাগ্যের কারণকে তারা এই আদি আদর্শ থেকে 'বিচ্যুতি'র জন্যই ঘটেছে বলে ব্যাখ্যা করে ; তাদের মতে প্রথম চার খলীফা (মুহাম্মদের উত্তরসূরী)'র পরে এই আদর্শকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলা হয়েছে।

ইসলামি মৌলবাদী শক্তিসমূহ গরম গরম কথাবার্তা বা কখনও সহিংস তৎপরতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও এই সকল দেশের শাসকবর্গের বিরোধিতা করে আসছে। কিন্তু তারা খুব সহজে সেই একই পুরোনো ব্যবস্থার নতুন ও অধিকতর বেপরোয়া অভিভাবক রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়। স্নায়ুযুদ্ধের সময় এই প্রবণতা জোরদার রূপ নেয় তখন মার্কিনিরা সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর ইসলামিক দেশসমূহকে তার সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীকে চেপে রাখা ও পরবর্তীতে তাকে টুকরো টুকরো করার কাজে ব্যবহার করার গ্রীনবেল্ট রণনীতি চালু করে (সবুজ র-কে ইসলামের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়)। ১৯৮০'র দশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আফগানিস্তানে ইসলামি মৌলবাদী শক্তির দ্রুত বিকাশে মদত যোগায় এবং এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই এবং তাদের ইউরোপীয় দোসরারা ইরানে খোমেনি ও তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে এক মহান বিপ্লব ছিনতাইয়ের সুযোগ করে দেয়। ভুয়া বিপ্লবী মুখোশের আড়ালে তারা নিজেদেরকে নতুন শাসক জান্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, প্রকৃত বিপ্লবকে ধ্বংস করে এবগ্ন বিপ্লবী ও কমিউনস্ট শক্তির উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। এটা সবার সামনে তুলে ধরা দরকার যে, ১৯৭৯ সালে ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইরান বিপ্লবের যে পরাজয় ঘটে তা ছিল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং ইরানের মৌলবাদী ইসলামি শক্তির যোগসাজশের ফল। মার্কিন জেনারেল হুইজার ঠিকই বলেছে, "আমরা

শাহ-এর গদি কেড়ে নিয়েছি এবং খোমেনিকে মসনদে বসিয়েছি" (এ ওয়ার্ল্ড টু উইন, ১৯৮৬/৬ সংখ্যায় ইরান বিপ্লব সংক্রান্ত তাঁর বইয়ের পর্যালোচনা দ্রষ্টব্য)। গত ২৫ বছরে, সবচেয়ে বড় ইসলামি জিহাদ-সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানিস্তান ইসলামি মৌলবাদীদের (এদের সাধারণ নাম হলো মুজাহিদীন, এটা যোদ্ধার আরবি প্রতিশব্দ) যুদ্ধের টাকা যুগিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা ইসলামি শক্তিগুলোর এই মুখোশ ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে এবং দেখিয়েছে যে এরা বিপ্লবী নয়, সাম্রজ্যবাদ বিরোধীও নয়। ইসলাম হলো ; এবং হতে পারে, একমাত্র শোষকদের মতাদর্শ ও হাতিয়ার।

ক্রমশ.....